জগদীশ গুপ্তের জীবন ও সাহিত্য

শম্ভু মিত্র

জগদীশ গুপ্তের জন্ম ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। কুষ্টিয়ায় পন্ডিত রামলাল সাহার পাঠশালায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। বিদ্যা শেষ হয় কলকাতার রিপন কলেজে (১৯০৭)।

১৫/১৬ বৎসর বয়সেই স্কুলে অথ৩ পুস্তক সামনে খুলে রেখে জগদীশ মায়ের কেনা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়তেন। নারী দেহ তৃষ্ণার আকুতিতে ভরা স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস অনুসারী কবিতাগুচ্ছ সহ জগদীশ ধরা পড়লেন একদিন। ফল স্বরূপ ১৯০৪ সালে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হল। ভর্তি করানো হল নীতি শাসিত সিটি কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯০৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে রিপন কলেজে ভর্তি হলেন। এক বছর না যেতেই তাঁর কর্মজীবন শু হল। বীরভূম, সম্বলপুর, কটক পাটনা কোর্ট হয়ে বোলপুর কোর্ট। ত্রিশ বৎসরব্যাপী কর্মজীবনে ায় ছিল সামান্য। শ্রম লঘু, দায়িত্ব অল্প, অবসর পর্যাপ্ত। অবসর সময়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন বিস্তর। বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালি কলমের সম্পাদকগণ জগদীশের লেখনী শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় পেয়ে তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছেনও প্রচুর। কল্লোল যুগেই তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বোলপুরে। জগদীশ নিজের পয়সায় গল্পগ্রন্থ বিনোদিনীপ্রকাশ করেন। বস্তি ও যৌন সাহিত্যের ছয়লাপের যুগে বিনোদিনী এক ঝলক নতুন বাতাস এনে দিয়েছিল বাঙলা গল্প সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'তোমার গল্পে নতুন রূপ ও রস দেখিয়ে খুশি হইলাম।' দর্শন শাস্ত্রের বিখ্যাত অধওাপক অনিলবরণ রায় বিচিত্রায় 'সাহিত্যে দুঃসংবাদ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বিনোদিনী নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর 'লঘুগু' উপন্যাস প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংসায় 'পরিচয়' বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় দিয়ে বললেন, 'জগদীশের রচনানৈপুণ্য আছে।' মোহিতলাল জগদীশের নির্বাচিত রচনার সংকলন প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। অকাল মৃত্যুর জন্য মোহিতলাল তা করতে পারেননি। শেষ বয়সে জগদীশের চোখে ছানি পড়ে। মোহিতলালের বন্ধুউচিত উপদেশ ('লেখা এখন ছেড়ে দিন। এ বয়সে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। কিন্তু সৃষ্টিশক্তি কমে') এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার ফলে জগদীশ শেষের দিকে তেমন লিখতেন না। লম্বা ছিপছিপে কালো রঙের গোঁফওলা সরল জগদীশ মারা যান ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রসঙ্গত বলা ভালো, জগদীশ গুপ্তের সামগ্রিক রচনা দুর্লভ হওয়ায় এই প্রবন্ধ তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য কর্মের মূল্যায়ণ নয়।

রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্য চি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ ছিল জগদীশ গুপ্তের। জগদীশের সমস্ত সৃষ্টি একটা গোটা সাহিত্যিক যুগের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি ছিল বুদ্ধিসম্ভব উপলব্ধি। জগদীশের ক্ষেত্রে সেটা ছিল জীবনবোধের অব্যর্থ ফলশ্রুতি। শিল্পী হিসেবে তিনি বিষয়গুলিকে জীবনের গূঢ় সমস্যা রূপে ধারণ করেছিলেন। তিনি কল্লোল পত্রিকায় নানা লেখা ছাপানোও কল্লোলের অফিসে কোনোদিনই য াননি। কিন্তু কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশের রচনাতেই অভিব্যক্ত। কল্লোলের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিক্রিয়া। জগদীশের দিকে না তাকালে মনে হয় কল্লোলের সমস্ত প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক চর্যায় পর্যবসিত বা পরিসমাপ্ত। বাংলা সাহিত্যে এই সময়টা ছিল রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র আমল । এঁদের মধ্যে শেষ দুজন পাঠক মানসে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। কল্লোলীয়দের সৃষ্টি করেছিলেন। কল্লোলীয়দের কাজ ছিল রবীন্দ্র-কথ াসাহিত্যের ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করে তোলা। শরৎচন্দ্রে লঘু করণের হাত থেকে কথা সাহিত্যকে পুনরায় রবীন্দ্রসম্মত জীবনচর্চায় দুরূহ পথের সন্ধানে ব্রতী করা। তা করেছিলেন সম্ভবত একমেবাদ্বিতীয়ম জগদীশ গুপ্তই। সে সময় প্রাক-যুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের ছকে প্রথম অলোড়নের আঘাত এসে পড়েছে। উপরের ত্রয়ী শিল্পী এই পরিবর্তনমুখী চেতনাকে গল্পে উপন্যাসে রূপ দিতে পারেননি। তখনো কথা সাহিত্যের মানুষেরা মাটির মানুষ থেকে আলাদা। মাটির মানুষেরা প্রাকৃত যন্ত্রণা শিল্পা য়িত হবার জন্য উন্মুখ। প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-প্রতিক্রীয়ার সীমায়তীতে এই কাজ সুচারূরূপে সম্পন্ন হল না। এঁদের রবীন্দ্র পতিক্রীয়ার পিছনে কাজ করেছে রবীন্দ্র-অতিক্রমণেচ্ছা। জগদীশ তা করেননি। রবীন্দ্রসম্মত জীবনচর্যার দুরূহ পথেই তিনি পা দিলেন। সৃষ্টি হল 'গতিহারা জাহবী'র। মাটির মানুষের প্রাকৃত যন্ত্রণা কল্লোলীয়দের মধ্যে জগদীশই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হলেন।

একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের প্রখর আঙ্গিক সচেতনতা ও বক্তব্যগত বিশিষ্টতা থাকা চাই। থাকা চাই জীবনাগ্রহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি। আগ্রহ থাকবে, আসক্তি নয়। অ াসক্তি মানেই আংশিকতা। আংশিকতা থেকে আকস্মিকতা এবং আকস্মিকতা থেকে অতিশয্যের জন্ম হয়। তাই আংশিকতা একজন ঔপন্যাসিকের প্রধান ত্রুটি। একজন ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক থাকা চাই — totality of objects থাকা চাই। অবশ্য totality of objects মানে cataloguing of details নয়, নয় শুধুমাত্র পরিধিগত পৃথুলতা। উপন্যাসকার যে জীবন আমাদের সামনে হাজির করেন সে জীবন সামগ্রিক এই কারণেই যে সে জীবন সৎ নয়, অসৎ নয়, শুদ্ধ নয়, নীতিদুষ্ট নয়, নীতিগ্রস্ত নয়; সে জীবন সীতার মতো বার বার অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে নিজ স্বরূপের পরিচয় দেবে কিন্তু পরীক্ষার অন্ত হবে না। এই সমগ্র জীবনকেই ইলিয়াড, অডিসি, রামায়ণ ও মহাভারতকাররা একদিন ধরতে চেয়েছিলেন। এঁদের সর্বতোমুখী সমগ্রতার জন্যই রাম পিতৃসত্য পালনে বনে যান, সীতা উদ্ধারে বালি বধ করেন। মানুষের এই পরীক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জীবনের সামগ্রিকতার পরীক্ষা। যিনি এতে উত্তীর্ণ হন তিনি সে কালে মহাকবি, এ ক ালে মহৎ ঔপন্যাসিক। আর্নলড্ কেট্ল প্রার্থিত জীবন ও তার বিন্যাস (life and pattern) এই দুয়ের যুগল দাবিতেই গড়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস। আম াদের বিচার্য হল ঔপন্যাসিকের আহৃত সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত তথ্য এবং উপাদান গভীর ও গূঢ় মনের ভিতর দিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা pattern-এ রূপ নিয়েছে কিনা, শেষ পর্যন্ত সমগ্র উপন্যাসটি লেখকের সমস্ত জীবনধারণায় একটি বিস্তৃত রূপকের আকার ধারণ করেছে কিনা। ঔপন্যাসিকের

অপরিহার্য প্রধান শক্তিই হল অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ও মনন সমৃদ্ধ কল্পনা। জগদীশ গুপ্তর বেশ কিছু রচনায় ঔপন্যাসিকের এই ব্রহ্মাস্ত্র ছিল — তাই আমরা লঘুগু, অস াধু সিদ্ধার্থ, গতিহারা জাহবী, সুতিনী ইত্যাদি উপন্যাস, দিবসের শেষে (অনেকের মতে গল্পটি 'a perfect piece of art')। যৌবনযজ্ঞের কবি মায়ের মৃত্যুর দিনে, চুন চুন সএ-হমারে মরী

ঐ ইত্যাদি গল্প পেয়েছি।

যে কোনো শিল্প সফল উপন্যাসে বাস্তব জগতে জীবনের অধ্যাস রচনার শক্তি রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। বাস্তুতন্ত্রী লেখক জগদীশ গুপ্তের লঘু গু উপন্যাস থেকে দু একটি উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে এই গূঢ় শক্তিতে তিনি কতখানি শক্তিমান ছিলেন। এইসব বর্ণনায় দেখা যাবে বিষয় ও বিষয়ীর এমন এক সাযুজ্য ঘটেছে যার বর্ণন া পাঠকের কাছে জীবন কল্পরূপ ধারণ করেছে।

১। 'টুকী স্বামীগৃহে অর্থাৎ সুন্দরীর ডোম পাড়াস্থ বাসভবনে পদার্পণ করিল ..... কিন্তু অনুষ্ঠান কিছুই হইল না। বধূকে কেহ বরণ করিল না, শাঁখ বাজিল না; হুলুধ্বনি উঠিল না ..... টুকী নিরীহ হইলেও সপ্রতিভ ..... এখন যেন তার বুক দু দু করিতে লাগিল — চোখ তুলিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখের লণ্ঠনের আলে াকে যতটা স্থান আলোকিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া সবই অন্ধকার — জনমানবের সাড়া নাই। ..... নির্জনতা ও নিঃশব্দতার মাঝে বসিয়া টুকীর মনে হইতেছিল ..... এ বাড়ির মাটিতে যেন স্ফূর্তি নাই, দুস্তর বিস্তীর্ণ একটা আবরণ কোথায় যেন চাপিয়া আছে — ময়লার স্তর একটির পর একটি করিয়া জমিয়া তাহাদের ভিতর দুর্গন্ধ আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই দুর্গন্ধ যেন এখন রন্ধ্র পাইয়া অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতেছে, কোথায় যেন অবিরাম একটি সাঁই সাঁই শব্দ উঠিতেছে।'

সপ্রতিভ হওয়া সত্ত্বেও টুকীর বুক দু দুর পশ্চাতের পরিবেশকে কি হিমশীতল কাঠিন্যের সঙ্গেই না ফুটিয়েছেন। 'লণ্ঠনের আলোকে যতটা স্থান আলোকিত হইয়াছে তাহা ছাড়া সবই অন্ধকার।' শব্দগুলির প্রয়োগে এবং অনুষ্ঠান 'কিছুই হইল না' এই ঘটনার ইঙ্গিতে লেখক বিষয় ও একীভূত করে এক নিমেষে টুকীর ভবিষ্যৎ রসিক পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন। পরিতোষ ও সুন্দরীর ডোমপাড়ায় বিয়েই হয় না, সুতরাং অনুষ্ঠানের বালাই নেই। 'অনুষ্ঠান কিছুই হইল না' এমনটি শাঁখও বাজিল না হুলুধ্বনি উঠিল না' — এতেই লেখক নিমেষে বুঝিয়ে দিলেন টুকী এক সম্পূর্ণ বিষাক্ত পরিবেশে এসে পড়েছে যেখানে 'ময়লার স্তর একটির পর একটি করিয়া জমিয়া তাহাদের ভিতর দুর্গন্ধ আহদ্ধ হইয়াছিল। সেই দুর্গন্ধ যেন এখন রন্ধ্র পাইয়া অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইয়াতেছে।'

২। 'টুকী আসিল এবং সুন্দরী মুগ্ধ হইয়া তাহার নিটোল যৌবনের দিকে চাহিয়া রহিল ..... কেমন একটা লালসা সুন্দরীর মনে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, যেন ইহাকে খন্ডখন্ড করিয়া সহস্র লম্পটের রিরংসা-দাহ তৃপ্ত দু হাতে বিলাইয়া দেয় ..... সুন্দরীর যৌবনোল্লাসের সুপ্ত প্রেতমূর্তি একবার দাঁড়াইয়া উঠিল ..... অগ্নি যেমন জিহ্বা বাড়াইয়া আহুতি গ্রহণ করে তেমনি করিয়া আগ বাড়াইয়া সুন্দরী হাসিয়া কহিল, বোস আমার কাছে। ..... তারপর কথা বন্ধ করিয়া সুন্দরী সূর্যাস্ত দেখিতে লাগিল। ..... দুটি আম গাছ সূর্যকে আড়াল করিয়া আছে; কিন্তু তাহাদের পত্রাবসরে যতটুকু দেখা যায় পৃথিবী আর আকাশ ততটুকু যেন রক্তে ভাসিয়া গেছে — সংকীর্ণ পথে দৃষ্টি চলিয়া রক্তসাগর বড় কাছে দেখাইচেছে আর কত জ্বলন্ত।'

'অগ্নি যেমন জিহ্বা বাড়াইয়া আহুতি গ্রহণ করে তেমনি করিয়া আগ বাড়াইয়া সুন্দরী হাসিয়া কহিল, বোস আমার কাছে।' এর পরেই জ্বলন্ত সূর্যোস্তের বাক্‌প্রতিম া। সূর্যাস্তের অগ্নিময় পরিবেশে সুন্দরী নিজেই আগুন হয়ে টুকীর যৌবনকে অন্য পাত্রের মাধ্যমে আহুতি দিতে সংকল্প করছে — একদিকে অগ্নিময় অস্ত সূর্যের সঙ্গে অগ্নিময়ী অস্ত যৌবনা সুন্দরীর তুলনা, তারই সঙ্গে সূর্য যেমন পৃথিবী ও আকাশকে অনিবার্য রূপে গ্রাস করেছে সুন্দরীও তেমনি টুকীকে গ্রাস করতে চাইছে — বিষয় ও বিষয়ীর কি অপূর্ব সাযুজ্য!

৩। 'টুকী পরিতোষের সৌখীন যৌবনকালের ফটোখানি বেড়ার সঙ্গে লটকাইয়া তাহাকে কাপড়ের মালায় বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল — পরিতোষ সেই মালাগাছা টনিয়া লইল .... সেটিকে পরিতোষ আরো ছিঁড়িয়া তার মালা নামটাই নষ্ট করিয়া দিল.... তারপর মাটিতে ফেলিয়া সেই ফুলগুলিকে পা দিয়া ঘষিতে লাগিল.....'

এখানে পরিতোষের এমন ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে যে, সে টুকীর পাতিব্রত্যের দাম দেয় না, এমন কি নিজ স্বামীত্বের কোনোও দামও নেই। এরপর টুকীকে পতিত াবৃত্তির পথে নামাইতে সুন্দরীর দ্বিধা রইল না — পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক।

ঔপন্যাসিকের বিষয় চেতনা শুধুমাত্র প্রকাশচেতনা বা আঙ্গিক সচেতনতা নয়, তার চেয়ে আরও বেশি কিছু। এইখানেই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানসের অস্তিত্বের যন্ত্রণার প্রসঙ্গ আসে। গোটা ব্যক্তি বিবেকের কথা একক অংশীভবনের ভিতর দিয়ে বলা যায় না, গোটা ব্যাক্তি বিবেকের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিটা যে সম াজের অংশ, সভ্যতার যে পর্যায়ের সে প্রতিনিধি তার বিচিত্র রূপও এই সব ব্যক্তিজীবনের আয়নায় নানাভাবে ছায়া ফেলে — ঔপন্যাসিকের বিষয়চেতনা এই সমস্ত কিছুকেই আত্মসাৎ করে। জগদীশের লঘুগু ও গতিহারা জাহবীর নায়িকাদের ছিল স্বামী নামক আদর্শ বা স্বামীত্বের ভাবাদর্শ বা স্বামীত্বের ভাবাদর্শের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। লঘু গুর টুকীর এই শ্রদ্ধা এসেছে সৎমা (পূর্বজীবনে বেশ্যা) উত্তমের দেওয়া শিক্ষা থেকে। কিন্তু গতিহারা জাহবীর কিশোরীর এই শ্রদ্ধার পূর্ব ইতিহাস জ ানা যায় না। ধরে নিতে আপত্তি নেই এই শ্রদ্ধা ট্রাডিশন্যাল। টুকী সেই ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আজীবন রাখতে চেয়েছিল চোখের সামনে স্বামীর ব্যাভিচারের চিত্র থ াকা সত্ত্বেও। কিশোরী স্বামীর ব্যাভিচারের হবু শিকার ভুবনের (ভুবন চারিদিকের ব্যভিচার ও স্বামীর নিঃস্পৃহতা সত্ত্বেও কি করে সতীত্ব বজায় রেখেছিল, তার যুক্তি, তথ্য লেখক উপস্থাপিত করেননি। জবানবন্দীতে স্বামীর প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পিত্রালয়বাসিনী হয়েছিল। স্বামীত্বের আদর্শের প্রতি তার আনুগত্য টুকীর মতো প্রবল নয়— সে যে শর্তাধীনে স্বামী গৃহে ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিল তার পিছনে কাজ করেছে জামাই ষষ্ঠীর সময় সইদের স্বামীদের শ্বশুরালয়ে আগমনগত পরিবেশ, ত ার বিবেকের তাড়নায় নয়। কিশোরীর ক্ষেত্রে এই অনুভূতি নিজ জীবনগত নয় তাই তার মর্মস্পর্শীও নয় কিন্তু টুকীর স্বামীত্বের আদর্শে অটুট স্থান থাকা সত্ত্বেও পরিবেশে অনিবার্যতায় 'ব্রহ্মান্ড্যাপী' অন্ধকারে নামতে সে বাধ্য হল— এখানে ব্যাক্তিবিবেকের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিটা যে সমাজের অংশ, সভ্যতার যে পর্যায়ে সে প্রতিনিধি তার বিচিত্ররূপে প্রতিফলন অব্যর্থ লক্ষ সন্ধানে সফল হয়েছে। তাই লঘুগু উপন্যাস হিসাবে এত সার্থক, এত মর্মস্পশী। কিশোরীর চিন্তায় সঙ্কট এসেছে একটা স্থূল ঘটনা—তার স্বামী চরিত্রভ্রষ্ট। কিন্তু টুকী স্বামীদেবতার বহুচারিতা মেনে নিয়েছিল। সুন্দরী পরিতোষের নির্দয় ঔদাসীন্যে টুকীকে পাপের পথে নামিয়ে দিল — টুকী এখানে অসহায়। কল্পনা করি, টুকীর স্বামীগত ভাবাদর্শ এরপর ভেঙে খান খান হল কিন্তু কি নিদাণ ট্রাজিডির মাধ্যমে! (এই সঙ্গে বলতে হয়,

অচিন্ত্যকে দেহদানে টুকী উদ্যত হওয়ার ঘটনা আকস্মিকতায় আমাদের বিস্মৃত করে-টুকীর দ্রমুর্তি হঠাৎই উদ্‌ঘাটিত হয় পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই। টুকী জানত সে স্বামী গৃহে নয়, সুন্দরীর বাসায় থাকে — তাহলে অচিন্ত্যকে স্বামীর ভিটা থেকে বেরোতে বলার সাহসই বা পায় কোথা হতে?

উপন্যাসের ভাষারীতি ঔপন্যাসিকের সফলতার অপরিহার্য অঙ্গ। সার্থক উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের অখন্ড কল্পনারই অনুবর্তী। উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা ও জীবনের কাব্য দুইকেই ধারণ করে। গদ্যের স্থল ও কাব্যের জল উভয়েই তাকে হতে হয় সাবলীল। কারো ভাত খাবার দৃশ্যে আসে লেখকের গদ্যের যথাযথ্য, আবেগময় ব্যক্তিচিন্তনের মুহূর্তে চাই কাব্যের ব্যঞ্জনা। তাৎপর্যময় উপন্যাস-ভাষার স্রষ্টা হিসেবে জগদীশের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যে দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট তাঁর রচনায় বারবার ছায়া ফেলেছে, তারই স্পর্শের হিমশীতলতা যেন তাঁর সমস্ত লেখায় অনুভবগম্য। যাকে আপাতদৃষ্টিতে অমনোযোগ বলে মনে হয়, তা তাঁর রচনায় কিছুক্ষণের মধ্যেই গূঢ় মনোযোগ বলে প্রতিভাত হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলিতে তাঁর গদ্য ও কবিতার চমৎকার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। অস্তমিত সূর্যের পৃথিবী ও আকাশকে রক্তে ভাসান — তৎসঙ্গে অনুচ্চারিত উপমায় সুন্দরী কর্তৃক টুকী যৌবনকে গ্রাস করার ইচ্ছা প্রকাশ এবং আগুন যেমন জিহ্বা বাড়িয়ে আহুতি নিয়ে থাকে তেমনি করে টুকিকে পাশে বসতে বলা — এই চিত্রকল্পগুলিতে জগদীশের কবি কল্পনাশ্লাঘ্য নিদর্শন বর্তমান। আবার টুকীর স্বামীগৃহে প্রথম আগমন উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠান না হওয়া, শাঁখ, উলু, কিছুই না বাজার মাধ্যমে জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্তের নীরসতা বর্ণনায় গদ্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ উচ্চ ধরনের বর্ণনার ক্ষমতার পরিচায়ক। লেখকের চিত্রকল্প, ব্যঙ্গ বিশেষণ ও উপমা প্রয়োগ ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়কর। কিছু উদাহরণ দিয়েই আমরা আপাতত ক্ষান্ত হব। (১) 'আমি পুতনা নই'— উত্তমের পৌরাণিক ভর্ৎসনায় বিস্তর আস্ত্র ও নিরস্ত হইল লেখককৃত বঙ্কিম শব্দাবলীর দ্বারা বিশেষণ ও উপমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে) (২) টুকীর বিমাতা যে বেশ্যা ছিল সে কথাটা মোক্ষর মা টুকীকে জানিয়ে দলের ভেতরে ফিরে এসে 'অপরিমেয় তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে গলিয়া এমন হাসিতে লাগিল যেন ইহজন্মে নিষ্কৃতির নাগাল সে পাইয়া গেছে' (গলিয়া ক্রিয়াপদের ব্যবহারও লক্ষনীয়)। (৩) 'মায়ের সম্বন্ধে টুকীর জানিতে কিছুই বাকী নাই কিন্তু প্রসূত ফলের রসমাধুর্যই সারা প্রাণ দিয়া অহর্নিশি সে উপভোগ করিয়াছে; চরিতার্থতায় ধন্য কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া গেছে, বৃক্ষমাতার কোথাও কদর্যতা আছে কিনা চোখ মেলিয়া তাহা দেখিতে যায় নাই।' (৪) 'টুকী ধপ করিয়া নামিল ঃ সে শব্দটা সুন্দরীর কানে প্রবেশ করিল বিরহকাতরার কানে সমাগত প্রিয়ের প্রথম পদধবনির মতো। (৫) 'অকিঞ্চন এমন বিশ্বকর্মা ভাব দেখায় যেন মানুষকে দিয়া সহ্য করাইবার আশ্চর্য কারখানাটি তাঁরই তাঁবে।' (৬) অকিঞ্চনের কাছে শ্বশুর শাশুড়ির কাকুতি মিনতি নিষ্ফল হল — 'দেবতার শিলা মূর্তির পায়ে মানুষ মাথা কুটিয়া কখনও অত নিষ্ফল হয় নাই।' (৭) 'সূক্ষ্ম কথা বলা বা অপরের বলিলে বুঝিয়া ফেলা অকিঞ্চনের মগজে দুর্দান্ত দৈত্য রাজ্যে সম্ভব নয়'। (৮) 'তোমার সেই ডুমুরের ফুল সইয়ের খবর কি? মিলনের পর প্রণয়যাত্রার প্রারম্ভেই এই সুবোধ প্রশ্নে স্ত্রীকে উদ্বোধিত করিয়া অকিঞ্চন ঘাটে বসিল'। (৯) হরিপ্রিয়া 'বাক্‌সিদ্ধির গর্বের গা ফুলাইয়া বাকরূপী ধর্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন.......... চোখে দেখিতে পাইলেন........ কিশোরীর আর রক্ষা নাই।' (১০) 'কিশোরীর সে স্মৃতির জগৎ প্রান্তরের মতো নিঃস্ব, ফাঁকা।' (১১) 'বাড়ি ঢুকিয়াই অকিঞ্চন দেখিল বাড়ির বিড়ালটি অঙ্গনে বিচরণশীল একটি শালিখের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। শালিখ .... ডালে বসিল .... উপরের দিকে হাঁ করিয়া .... রহিল।' (১২) 'জগবন্ধুর মনে হইতে লাগিল ..... তিনি গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার একটি বস্তু।' (১৩) অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে তাহা অনিবারণীয় .... ইহা দাঙ্গা নহে যে লোক আর লাঠি সংগ্রহ করিয়া একবার লড়িয়া দেখা যাইতে পারে; ইহা খাজানা বৃদ্ধির মামলা নহে যে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রমাণ করিতে পারিলেই জয় নিশ্চিত; ইহা রোগও নহে উপবাস দিয়া এবং ডাক্তার ডাকিয়া একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে .... ইহা একেবারে চরম প্রাপ্তি — মৃত্যুর মতো নিঃশেষ, বিচ্ছিন্নতর।' (১৪) 'পরিতোষ বলে, আমাকে ধরাধামে রাখাবার ইচ্ছে হরির নেই।' .... কিন্তু হরি ঠাকুরের পরিতোষকে রাখিবার ইচ্ছাটা একেবারেই যায় নাই .... তিনি পরিতোষকে দিয়া টুকীর একখানি অলংকার চাহিয়া লইয়া গেলেন।' (এইসব উদ্ধৃতির মধ্যে কোথাও কোথাও জগদীশের ঈশ্বরগত অনীহা এবং ভাগ্যের অনিবার্যতাও অভ্রান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে।)

এবার জগদীশের উপন্যাসের কিছু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 'নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ'— এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্টের লিখনের টানেই আমাদের অনেকে ব্যর্থতার জন্ম। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' নটবরের ব্যর্থতার কারণও এখানেই নিহিত। নটবর নামে এক অসাধু পাঁক-ঘাঁটা চরিত্র সিদ্ধার্থ নামে এক উজ্জ্বল চরিত্রে ছদ্মবেশ নিয়েছিল উদ্দেশ্য ছিল শুদ্ধতাভিসার। কিন্তু কর্মফলকে সে মুছবে কি করে? সে ছিল বৈষ্ণবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের জারজ পুত্র, অর্থলোভে বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যা সহচর, ঋণে আকণ্ঠ জর্জরিত। অজয়াকে ভালোবাসার ইচ্ছায় সিদ্ধার্থর ছদ্মবেশকে বাস্তবায়িত করে সে খাঁটি হতে চাইল। কিন্তু অতীত জীবনের প্রেতভূমির অধিবাসীর তা হতে দেবে না। অজয়ার ভালোবাসার নটবর ভালো হতে চায় কিন্তু মিথ্যা খতে সাক্ষী হিসাবে আসে রাসবিহারী যাকে দেখলে মনে হয় জগৎ অপরিবর্তনীয়। নটবরের সমস্ত অভিনয় ও ছলনা স্বপ্নে আসল সিদ্ধার্থের রূপ জগদীশের। তাঁর মতে 'ভগবান ধর্ম নৈতিকতা এ সবই যে শুধু মিথ্যা তাই নয়, এ সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রূরহৃদয় শয়তান' (অধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ ঃ অনিলবরণ রায় ঃ বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৬)। জগদীশের অনন্য বৈশিষ্ট্য বিশ্ব নিয়মের অমোঘ বিভীষণ পরিণাম সম্পর্কে তাঁর আত্মিক বিশ্বাসের অবিচল দৃঢ়তা। এর দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বরকে ঘৃণা করতে পেরেছেন খুব কম বাঙালি সাহিত্যিক। বিশ্ব নিয়তির বিভীষিকাময় পরিচয় ও পরিণাম সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস তাঁর পক্ষে একান্ত অভ্রান্ত — প্রায় নিজের অস্তিত্বের মতোই — এর বিরুদ্ধে শিল্পীর অনুচ্ছ্বাসিত কঠিন যথাযথ তির্যক স্পষ্টোক্তি আসলে তাঁর আহত আত্মার জমাট আক্রোশেরই অপ্রতিহত কাঠিন্য দিয়ে গড়া। তাঁর অতুল্য সৃষ্টি আসলে তাঁরই আত্মসৃষ্টি।

'যৌবনযজ্ঞের কবি' গল্পে লেখক যেন প্রাগৈতিহাসিক স্থপতির কুঠার হাতে করে কঠিন পাথরের গায়ে সম্পূর্ণ বাস্তব মূর্তি এঁকেছেন। 'দিবসের শেষে' গল্পে রতির চতুর্থ সন্তান পাঁচু (অন্যরা মৃত) কুমীরের পেটে গেল। পাঁচু এ ব্যাপারে সকাল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। আশ্চর্য, এর আগে কামদা নদীতে কেউ কুমীর দেখেনি। একটি বিভীকাময় মৃত্যুকে উপলক্ষ করে Villainy-র কি বিভৎস চিত্রণ! অথচ Villainy আর কারো নয়, অখন্ড জীবনের। জীবন সম্পর্কে কি নীরন্ধ্র বিষালুতায় চেতনা আচ্ছন্ন হলে এমন দুঃসাহসী ভাবনা উপস্থাপিত করা চলে শিল্পের ভাষায়—তা অকল্পনীয়। কঠিন সুমিতির সঙ্গে তীর্যক বাকভঙ্গি (তদানুষঙ্গী আতিশয্যের অনুপস্থিতিও) তাঁর বহু গল্পেই লভ্য। 'মায়ের মৃত্যুর দিনে' পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রীর অন্ধ পৈশাচিক অর্থলোলুপতা জীবনের প্রতি অকল্পনীয় ধিক্কারের অন্ধতায় গগনচুম্বি হয়ে উঠেছে। কন্যাপুত্র সহ সস্ত্রীক কেশব মায়ের সঙ্গে গ্রামে থাকে, অন্য পুত্র রাম সস্ত্রীক কর্মক্ষেত্রে প্রবাসী। সারা জীবন ধরে মায়ের ৫০০০ টাকা মূল্যের গয়নার লোভে কেশব মায়ের শেষ ইচ্ছা — মৃত্যুর পূর্বে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ — পূর্ণ হতে দেয় না। পাছে ৫০০০ টাকার ভাগ রামকে দিতে হয় কেবল এই ভয়ে কেশব মার অসুখের তীব্রতাকে লঘু করে রামকে মিথ্যা খবর দিয়েছে, নাভিশ্বাস ওঠার পরেও রামের নামে মিথ্যা ভাণ্ডানি গেয়ে মার মন বিষাতে চেয়েছে। প্রাণহীন মাকে তুলসীতলাস্থ করেই ছুটেছে দেরাজের চাবির সন্ধানে। দেরাজ থেকে গয়নার বাক্স লোপাট করে তবে বসেছে মার জন্য বিস্তারিত শোক জানাতে। মানব বৃত্তির অন্ধকার রূপ চিত্রণের যে একঘেয়েমি প্রত্যক্ষ বাস্তবের পক্ষেও অস্বাভাবিক। জগদীশের গল্পে তার প্রাতীত অনিবার্যতা আসলে শিল্পীরই বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ফলশ্রুতি। 'চুন চুন সএ হমারে মরী ঐ' গল্পের নায়ক শিবপ্রিয় কর্তৃক সুখের সংসার ছেড়ে সোনা তৈরীর কৌশল শেখার জন্য সাধুর পশ্চাদ্ধাবন করা — অবশেষে মোহভঙ্গ

হয়ে ফিরে আসা — স্ত্রী নিত্যার আত্মহত্যা — আর্ধোন্মাদ হয়ে মা সহ শহরে আগমন — মায়ের মৃত্যু — উন্মাদ শিবপ্রিয় বেছে বেছে শত্রু নিপাতের কামনা — এখানেও নিয়তির ক্রূর অবাধ্যতার রূপ প্রকটিত। 'পামর' পুত্রের কর্মে অবসরপ্রাপ্ত পিতা লজ্জায় নিদ্দেশ হন। পিতার জীবদ্দশায় পুত্র পিতার কর্মস্থলের বন্ধুদের ক াছে পিতার মৃত্যু মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে জুয়াচুরির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করেছে — এত গ্লানি কোনো পিতা সহ্য করতে পারে? এ ক্ষেত্রে তাঁর নিদ্দেশ হওয়া জীবনের একমাত্র স্বাভাবিক গতি। 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী'তে জসিম বৌকে উদ্ধারের জন্য অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে কি হবে, শেষ পর্যন্ত বৌ-ই ফিরে এল না। 'পয়ে ামুখম' গল্পে দেখানো হয়েছে পিতা পুত্রের বিবাহগত পণ প্রাপ্তির আশায় একটির পর একটি পুত্রবধূকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছে অথচমুখে স্নেহ আদরের এতটুকু অভাব নেই। গল্পটির শেষেপুত্র কর্তৃক পিতার ভন্ডামি ধরে ফেলার চিত্রটি বড়ই সুখের। জগদীশের দুঃখভরা জগতের মধ্যে সুখের সন্ধান যেসব গল্প করেছে, তাদের মধ্যে এই গল্পের স্থান অতি উচ্চে।

প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডিতে নিয়তির ভূমিকার কথা আমরা সকলেই জানি। এই নিয়তির সঙ্গে জগদীশের কথা সাহিত্যের শয়তানী শক্তির তুলনা করা চলে। তবে সেই গ্রীক নিয়তিতেও রাজ্য আছে —'moderation' আছে। 'moral order' আছে। মানুষ নিজ কর্মফলেই নিয়তির নির্মম আঘাত নিজের উপর ডেকে অ ানে—নিয়তিগত এই বিজনীন মনোভাব জগদীশে অনুপস্থিত। রতির ছেলে পাচুঁকে কুমীরে নিয়ে যায় — সীতাপতি (তৃষিত আত্মা) প্রেত হয়ে তিন মাসের শিশুকে শুষে মেরে ফেলে, আত্মীয়ের মৃতদেহের সৎকার হয় না (পল্লী শান) নদীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পরে সে দেহ ভেসে উঠে তাদেরই ঘাটে এসে লাগে। পরম াত্মীয়ার চোখের সামনে শিয়াল কুকুর কাক শকুন ঝাপটাঝাপটি কাড়াকাড়ি করে সেই দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। নামগোত্রহীন মুমূর্ষ লোককে (পুরাতন ভৃত্য) বাঁচানে ার প্রতিদানে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐ ভৃত্যেরই হাতে ছুরিকাহত হয়। টাকা নিয়ে ভৃত্য চম্পট দেয়। অর্থাৎ জগদীশ বলতে চান তুমি ভালো হও বা মন্দ হও, নিয়তি খেয়াল খুশি মতো প্রতিশোধ নেবেই।

জগদীশের রচনায় বাঙালি দুর্লভ কাঠিন্য ও সংহতি আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সহজে সুপাচ্য বা সুসহ হয়নি। মধুসূদন সুলভ গদ্য রচনার Classical brevity (হেক্টর বধ কাব্য দ্রষ্টব্য)। জগদীশেও প্রাপ্তব্য। বলা বাহুল্য এই শৈলী বাঙালি জীবনে অননুকরণীয় ছিল — তাই জগদীশ গুপ্ত আজ বিস্মৃত বা অবহেলিত। (অবশ্য এ কথাও সত্য, জগদীশের এমন লেখা বিরল যা পড়বার সময় কেবল নাগপাশের মতোই আকর্ষণ করে না, পাঠান্তে রসবোধকে উদ্দীপ্ত, তৃপ্ত ও চরিতার্থ করে তোলে।) একমাত্র কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া জগদীশের শিল্প স্বভাবের আত্মীয় আর কেউ নেই। উদাসীন অদৃষ্ট করেছিল। জগদীশের মোদ্দা বক্তব্য হল মানুষ তার কর্মফলকে মুছে ফেলে স্বাধীন শুদ্ধতাভিসারী হতে চায়। অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষের পরাজয়কে তিনি অবশ্যই প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু তিনি কখনই মানুষকে ছোট করে আঁকেননি (অসাধু সিদ্ধার্থের নটবরকেও না)। জগদীশের শিল্প সম্পর্কে এইটেই বড় কথা। তাঁর সাধনায় আংশিক বা ফাঁক ছিল না। তঁ ারই জীবদ্দশায় শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন। কিন্তু শরতের আংশিকতা তাঁর মনঃপূত হয়নি — এ নিয়ে প্রকাশ্যে শরৎ সাহিত্যের সমালোচনাও করেছিলেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে, সাহিত্যে সম্পর্কে, নিজের সৃষ্ট চরিত্র সম্পর্কে একই কথা খাটে। জগদীশের জীবনে আপোষ ছিল না; তাই আমরা তাঁর কাছ থেকে এমন এক সাহিত্য পেয়েছি, যা বাংলা সাহিত্যে অনন্যপূর্ব।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com